অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম পর্যায় : উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও ভবতোষ দত্তর সান্নিধ্য

অমিয় কুমার বাগ্‌চী

আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হাতেখড়ি হয়েছিল অসাধারণ কয়েকজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। তাঁরা হলেন উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভবতোষ দত্ত, তাপস মজুমদার এবং পঞ্চানন চক্রবর্তী।

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স নিয়ে পাশ করেছিলাম ১৯৫৩ সালে। আই.এসসি. পড়ার দ্বিতীয় বৎসরেই ঠিক করেছিলাম স্নাতকস্তরে অর্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়ব। সে-সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই স্নাতক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন এই বিষয় নিয়ে পড়তে শুরু করলাম তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য তাঁকে আড়ালে 'বাচ্চা ঘোষাল' বলা হত)। আর তিনজন অধ্যাপক ছিলেন রমেশচন্দ্র ঘোষ (তিনি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন), ভবতোষ দত্ত এবং তাপস মজুমদার। আমি এখানে শুধু অধ্যাপক ঘোষাল এবং অধ্যাপক দত্তর সম্বন্ধে কিছু বলবো।

অধ্যাপক ঘোষাল প্রথম ক্লাসেই বললেন যে যারা আই.এসসি. পড়ে এসেছে, তারা একদিক থেকে যারা আই.এ. পাশ করে ভর্তি হয়েছে তাদের থেকে ভাগ্যবান, কারণ তাদের কোনও কিছু unlearn করতে হবে না। একথার মর্মার্থ হল এই যে আই.এ.-র একটা বিষয় ছিল Civics, যেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞানের কিছু গোড়ার অংশ পড়িয়ে দেওয়া হত। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়েই সেগুলো ভুলভাবে পড়ানো হত, এবং স্নাতকস্তরে একই জিনিস অন্যভাবে পড়তে হোঁচট খেতে হত। অধ্যাপক ঘোষাল আমাদের অনেক বই পড়তে বলেছিলেন এবং ক্লাসে তার তালিকা দিতেন। দুয়েকজন পূর্বতন ভালো ছাত্রের নাম করে বলেছিলেন যে তারা দিনে আঠারো ঘন্টা পড়েছে। আমি প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এত বই পড়ব কী করে? দ্বিতীয়ত, আঠারো ঘন্টা পড়া তো আমার ধাতে আসে না। যখন মন বসাতে পারি, পড়ি ; যখন পারি না, তখন গল্পের বই, কবিতার বই, বিষয়বহির্ভূত বই পড়ি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই, আর যেদিন সেরকম সৌভাগ্য হয়, গান শুনি অথবা সিনেমা দেখি। থাকতাম ইডেন হিন্দু হস্টেলে। সেখানে আড্ডার অফুরন্ত সুযোগ। হস্টেলের পাঠাগারের কল্যাণে এবং বন্ধুবান্ধবদের দাক্ষিণ্যে বই, বিশেষ করে উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, কবিতা এবং স্নাতকবিষয় বহির্ভূত বই পড়ার অঢেল সুযোগ। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় পালচৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সেইভাবেই। তার হাতে একটা বই দেখে বলেছিলাম, এটা পড়তে পারি। জ্যোতির্ময়ের উত্তর ছিল, আমার পড়া হলে। সেভাবে আরও কিছু ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, যা এখনও বজায় আছে।

অধ্যাপক ঘোষালের কথায় খানিকটা ঘাবড়িয়ে গেলেও আস্তে আস্তে বুঝলাম যে তিনি অনেক বইয়ের নাম বলেন এইজন্যে যে ছেলেরা যাতে সেগুলোর অন্তত খানিকটা পড়ে যাচাই করে নিতে পারে কোন্ বইটা কোন্ কাজে লাগবে, অথবা যখন একই বিষয় দুটো বইতেই বিবৃত হয়েছে তখন কোন্‌টাতে তার উৎকৃষ্টতর আলোচনা আছে। তিনি Harold Laski-র *Grammar of Politics*-এর reference দিতেন। কিন্তু নিজে পড়াতেন প্রধানত Ernest Barker-এর *Principles of Social and Political Theory* বা *Reflections on Government*-এর যুক্তি ধরে। একইভাবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা পড়াতে গিয়ে ব্যবহার করতেন Dennis Brogan-এর বই বেশি, যদিও Herman Finer-এর বইয়েরও reference থাকত। অধ্যাপক ঘোষাল মূলত জন স্টুয়ার্ট মিল, টমাস হেনরি গ্রীন, আর্নেস্ট বার্কারের ধারায় উদারপন্থী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করতেন। একই সঙ্গে তাঁর reference ধরেই আমরা অন্য স্বাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছিলাম। সেগুলোর মধ্যে আমার বিশেষভাবে মনে আছে Francis W. Coker-এর *Recent Political Thought*, যেখানে fascism-এর চরিত্র এবং তার শেকড় নিয়ে আলোচনা আছে, R.M. Mclver-এর *Modern State* এবং *Web of Government*। এইসব বইতে রাষ্ট্র কাঠামো এবং বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিষ্কার আলোচনা আছে। পরের ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগের বা বর্তমান সন্ত্রাসবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ যে গণতন্ত্রের প্রচারকের মুখোস ধরে আছে, তার স্তাবকদের লেখা বইয়ের তুলনায় এগুলি অনেক বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য গ্রন্থ।

অধ্যাপক ঘোষাল এবং আমার অন্য শিক্ষকদের মনের উদারতা এবং ছাত্রবাৎসল্য কী রকম প্রসারিত ছিল তা আমার নিজের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়েই নির্দেশ করব। আমি স্নাতক শ্রেণীতে ছাত্রদের রাজনীতিতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। সেই সময়ে একটা বড় শিক্ষক ধর্মঘট হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকরা খুবই কম বেতন পেতেন। এমন কি অনেকের বেতন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের Group D কর্মচারীদের (যাদের তখন 'বেয়ারা' বলা হত) চেয়েও কম ছিল। জনশ্রুতি ছিল যখন এ বিষয়ে তদানীন্তন প্রভূত ক্ষমতাশালী শিক্ষাসচিবের কাছে অভিযোগ করা হয় তিনি বলেছিলেন, তাহলে শিক্ষকরা বেয়ারার চাকরি নিলেই পারেন। কলেজে স্ট্রাইকে যোগ দিচ্ছি, গোয়ামুক্তির মিছিলে যাচ্ছি, ছাত্র ইউনিয়নে লড়ছি—এই সবের মধ্যে কখনও কখনও পরীক্ষাও দিচ্ছি না। যেমন চতুর্থ বর্ষের Pre-test পরীক্ষায় শুধু পাসের বিষয়গুলির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ঠিক তার পরেই অধ্যাপক ঘোষাল বারান্দা দিয়ে হাঁটছেন, আমি তাড়াতাড়ি পাশে সেঁধিয়ে দাঁড়িয়েছি। উনি এক নিমেষ থেমে শুধু বললেন, 'অমিয়, পড়াশোনা করছ তো?' সৌভাগ্যক্রমে টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফল হল এবং অধ্যাপক ঘোষাল আমার লেখার তারিফ করলেন এই বলে যে, আমি নাকি প্রশ্নগুলোকে সোজাসুজি আক্রমণ করি (ধানাইপানাই করার ধৈর্য না থাকায়)।

অধ্যাপক ঘোষালের পড়ানোর সময় তাঁর উদারতার আরও পরিচয় পেয়েছিলাম। আমি সবেমাত্র অর্থবিজ্ঞানে পড়েছিলাম যে কতকগুলি অনুমানের ভিত্তিতে দেখানো যায় যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাণিজ্যসংস্থার প্রতিযোগিতার ফল যা হবে তা সামাজিক মঙ্গলের নিরিখে একচেটিয়া সংস্থার কার্যকলাপের ফলের চেয়েও খারাপ হতে পারে। অনুরূপ যুক্তি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চালান করে আমি সওয়াল করলাম যে উদারপন্থী মতাদর্শে যে কয়েকটি দলের প্রতিযোগিতা-

সংবলিত গণতন্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলা হয়েছে তা সবক্ষেত্রে ঠিক না হতে পারে। যদি এমন একটা দল শাসন করে যা সত্যিই সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য কাজ করে, তবে সেই শাসনব্যবস্থা বহুদলীয় গণতন্ত্রের চেয়ে শ্রেয় হতে পারে। এখন জানি যে আমার যুক্তিতে বেশ কয়েকটা ছেঁদা ছিল। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষাল আমার লেখা পড়ে আমার সহপাঠীদের সেটা পড়তে বলেছিলেন।

বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় আমি প্রথম শ্রেণী নিয়ে পাশ করব আমার এবং আমার শিক্ষকদের এরকম প্রত্যাশা ছিল। তারপরে দেখা গেল আমার স্থান হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (সে বৎসর অর্থ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সে একজন মাত্র প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েছিল, সে হল জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ক্লাসে আমার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী)। আমি ছয়টি পেপারের তিনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলাম, আর তিনটি পেপারে শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ নম্বর পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা আমার আগেও অনেক 'ভালো' ছাত্রের ভাগ্যে ঘটেছিল। আমার আগের বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছিলেন মিহির রক্ষিত। কিন্তু তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তিনজন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেও মিহিরদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন (এম.এ. পরীক্ষায় তিনি তাঁর যথাযোগ্য স্থান পেয়েছিলেন)।

আমার বি.এ. পরীক্ষার ফলের ব্যাপারে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারণ অনেকের ধারণা অতীতকালে লেখাপড়া সব জায়গায় ভালো হত এবং পরে খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার একজন শাস্তিদায়ী পরীক্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কেম্‌ব্রিজে পি.এইচ.ডি. করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ডাহা ফেল করে এসেছিলেন। কেম্‌ব্রিজ বা অক্‌স্‌ফোর্ড অনেক সময় পি.এইচ.ডি.-র অসফল ছাত্রকে বলে আরেকবার লিখে দাও অথবা একটা নিচু স্তরের ডিগ্রি দিয়ে সেই ছাত্রকে বিদায় করে। এই অধ্যাপকটির কপালে এর দুটোর কোনটাই জোটে নি। কিন্তু তাঁর সেই থিসিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিল। শুনেছি তিনি অ্যালফ্রেড মার্শালের পরে আর কোনও অর্থনীতিবিদের লেখা পড়েন নি এবং খুব সম্ভব মার্শালও ঠিকমতো বোঝেন নি।

আমার বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর অধ্যাপক ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে বললাম, "স্যার, আমি আর এম.এ. পড়ব না। আমার বাড়ির অবস্থা খুব ভালো নয়। এতদিন পড়তে পেরেছি তার একটা কারণ কলেজের মাইনে দিতে হয় নি, উপরন্তু যাকে প্রথম শ্রেণীর জলপানি বলা হত, তাই পেয়েছি। এখন মাইনে দিয়ে আর কোনও স্কলারশিপ না পেয়ে যে খরচ হবে, আমার বাবার পক্ষে তা বেশ দুঃসহ হবে।" অধ্যাপক ঘোষাল আমাকে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিলেন। বললেন যে, "পরীক্ষকদের মিটিংয়ে গিয়ে বলেছি যে, এই ছেলে চার-এর ঘরে নম্বর কোনও পেপারেই পেতে পারে না" (তিনি আমাকে ১০০তে ৭৩ দিয়েছিলেন)। "কিন্তু আমার হাতে তো অন্যদের নম্বর বদলানোর ক্ষমতা নেই। আমি বলছি, তুমি এম.এ. পড়ো, ফল ভালো হবে।"

আমি অধ্যাপক ঘোষাল এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের প্রণোদনায় এম.এ. পড়তে ভর্তি হলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার ঠিক ওপরের নম্বর পাওয়া দুজন ছাত্র বিদেশে চলে যাওয়ায় আমার ভাগ্যে Jubilee Scholarship নামের ২৭ টাকার একটা জলপানি জুটে গেল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনেও মকুব হল। তার সঙ্গে গোটা দুয়েক প্রাইভেট টিউশনি জোগাড় হয়ে যাওয়ায় বাবার কাছে আর খরচের জন্যে হাত পাততে হয় নি।

অধ্যাপক ঘোষালের স্নেহ যে কত গভীর ছিল তার আরেকটা উদাহরণ দিয়ে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাপ্ত করব। অধ্যাপক ঘোষাল প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন (এত দীর্ঘকাল সেই কলেজে পড়ানোর নজির আর কারও আছে কিনা সন্দেহ)। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি টানজানিয়ার একটি UNESCO স্থাপিত প্রশাসন শিক্ষা সংস্থায় অধ্যাপনা করতে গিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৬ সাল নাগাদ যখন আমি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, অধ্যাপক ও শ্রীমতী (নমিতা) ঘোষাল ইংল্যান্ডে বেড়াতে এলেন। অধ্যাপক ঘোষাল আমাকে লিখে বললেন তাঁর সঙ্গে লান্‌ডনে এসে দেখা করতে। তাঁরা উঠেছিলেন রাসেল স্কোয়ারের রাসেল হোটেলে। রাসেল স্কোয়ারের কাছেই লান্‌ডন বিশ্ববিদ্যালয় আর আশপাশের অংশে ভারতীয় ছাত্রদের সরকারি আবাস এবং বহু ভারতীয় ছাত্রের বাস তখন। আমি কেম্‌ব্রিজ থেকে এসে ওঁদের প্রণাম করে রাসেল হোটেলেই মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলাম। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট স্মৃতির কথা বলি যাতে বোঝা যাবে যে মানুষের ধর্মান্তরণ তাদের সমস্ত সংস্কার বদলে দিতে পারে না। অধ্যাপক ঘোষাল আর আমি একটা করে সুপ দিয়ে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মাসিমা বললেন তিনি সুপ খাবেন না, কারণ প্রত্যেক সুপেই গোমাংসের মিশেল থাকে। ততদিনে কিন্তু অধ্যাপক ঘোষাল এবং মাসিমা দুজনেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। খাওয়া শেষ করে আমি যেই বিল শোধ করার জন্য টাকা বের করেছি, অধ্যাপক ঘোষাল আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি তাঁর স্নাতক শ্রেণীর বেঞ্চিতে বসে অত্যন্ত গর্হিত কোনও কাজ করেছি। আমি মিনমিন করে বললাম, 'স্যার, আমিও তো রোজগার করছি।' উনি ধমকে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে?' কিছুতেই আমাকে বিলের টাকা দিতে দিলেন না।

আমার মতো পাঁড় নাস্তিকের প্রতি তাঁদের এই স্নেহ তো শোধ করার নয়। অধ্যাপক ঘোষাল প্রয়াত হলে আমি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সে তাঁর স্মৃতিশ্রদ্ধাসভার আয়োজন করেছিলাম। আর তিনি বেঁচে থাকতে অধ্যাপক তাপস মজুমদারের সম্পাদনায় তাঁর সম্মানে *Growth and Choice* নামে যে বইটি অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমার একটা লেখা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবনের সত্যিকারের ঋণগুলি চিরতরে অপরিশোধ্য থেকে যায়।

আমি যখন অর্থবিজ্ঞানের পড়া শুরু করি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সবচেয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ভবতোষ দত্ত। তিনি London School of Economics থেকে পি.এইচ.ডি. করে এসেছিলেন এবং ১৯৫২ সালে প্রকাশিত *The Economics of Industrialization* তাঁর একটি সাড়া-জাগানো বই ছিল। ভারতীয় কোনও লেখকের ঐ বিষয়ে সমমানের আর কোনও বই ছিল না। আমি মনে করি এখনও সে বই পড়লে ছাত্ররা উপকৃত হবেন।

অর্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব অধ্যাপক দত্তর অপেক্ষা প্রাঞ্জল করে কোনও শিক্ষক পড়াতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তিনি আমাদের মাত্র মাস তিনেক পড়িয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৩

সালের শেষেই চলে গিয়ে তিনি International Monetary Fund-এর South Asian Division-এর প্রধান হয়েছিলেন। তার আগের তিন মাসে তিনি আমাদের প্রধানত পড়িয়েছিলেন Consumer behaviour theory অর্থাৎ কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ ভোগ্যপণ্য কেনে : তার আয়ের কত অংশ সে খাবারের পিছনে ব্যয় করে, কত অংশ মাথা গোঁজার জন্য, কত অংশ চিকিৎসার জন্য ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে আয়ের স্তরের সঙ্গে ভোক্তার ব্যয় বিভাজনের প্রভেদ। অর্থবিজ্ঞানীরা নানা তত্ত্ব দিয়ে এসবের বিশ্লেষণ করেছেন এবং তথ্য দিয়ে তাঁদের তত্ত্বের যাথার্থ্য যাচাই করেছেন। ভারতবর্ষের তথাকথিত দারিদ্র্যসীমার আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তথ্য-তত্ত্বের কচকচি আজও পত্রপত্রিকায় বড় স্থান অধিকার করে আছে।

অধ্যাপক দত্ত পড়িয়ে যেতেন ঝড়ের বেগে। যে সব ছাত্র শিক্ষকদের কথা সারাক্ষণ মক্স করে পরীক্ষার জন্য তৈরি হয় তাদের পক্ষে এই শিক্ষণপদ্ধতি পছন্দসই ছিল না। ১৯৫৬-৫৭ সালে অধ্যাপক দত্ত যখন দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M.A. ক্লাসে Welfare Economics পড়াতে আরম্ভ করলেন, আমার এক সহপাঠী—যাকে মোটেই নিকৃষ্ট ছাত্র বলা যাবে না—আমাকে বলেছিল যে সে অধ্যাপক দত্তের তুলনায় আমাদের এক অতি নিম্নমেধা অধ্যাপকের পড়ানো পছন্দ করে, কারণ তিনি ক্লাসে নোট দেন। কিন্তু অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত সেই দ্রুতগতি পড়ানোর মধ্যে অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে তত্ত্বের উপযোগিতা বোঝাতেন, তত্ত্বের দুরূহ অংশগুলি ফিরে ফিরে বলে যেতেন। আমি সাধারণত তাঁর বক্তৃতার সময় কোনও নোট না নিয়ে বিকেল বা সন্ধ্যেয় সেই দিনের পড়ানোর নির্যাসটুকু লিখে রাখতাম। তাঁর পড়ানো এমনভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যেত যে পরে সেইগুলি আর নতুন করে পড়তে হত না।

স্নাতক শ্রেণীর প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর পক্ষে অধ্যাপক দত্তর মতো প্রাঞ্জল ভাষায় পড়ানোর কোনও বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না। পরের দিকে অবশ্য মনে হয়েছে তাঁর ভদ্রতা এবং বিনয়বোধ অনেক সময়ে তাঁকে নিজের চিন্তার সীমায় পৌঁছতে দেয় নি। তাতে ছাত্রদের বা শ্রোতাদের কোনও ক্ষতি হয় নি, কিন্তু তার ফলে পরের যুগের পাঠকরা অর্থশাস্ত্রে তাঁর মেধার উৎকর্ষের সম্যক পরিচয় পায় নি। আমরা যখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত আমাদের পড়াচ্ছেন, তখন I.M.D. Little-এর *A Critique of Welfare Economics* একটি অবশ্যপাঠ্য বই ছিল। কোনও নীতি বা অবস্থার পরিবর্তনের ফলে গণ-মঙ্গল বর্ধিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে লিট্ল্ তাঁর আগের প্রচলিত হিক্স, কালডর, স্কিটভস্কি ইত্যাদির নিরিখের সঙ্গে নিজস্ব একটি নিরিখ যোগ করলেন, যার মোদ্দা কথা ছিল যে অন্য নিরিখের সঙ্গে আয়ের বৈষম্যের কথাও আনতে হবে। কিন্তু মুশ্‌কিল দাঁড়ালো ঠিক করা যে আয়ের বৈষম্যকে কতখানি গুরুত্ব দিতে হবে এবং কখন দিতে হবে। এই আপত্তি তুলে চার্লস কেনেডি এবং রবার্ট বল্‌ড্‌উইন লিট্‌লের নিরিখকে তুলোধোনা করলেন। লিট্ল্ তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সমালোচনার উত্তর দিলেন। অধ্যাপক দত্ত অতি সুন্দরভাবে সমস্ত নিরিখগুলির ব্যাখ্যা করে এবং লিট্‌লের উত্তর আলোচনা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি একবারও বললেন না যে লিট্‌লের উত্তরে কেনেডি-বল্‌ড্‌উইনের আপত্তির খন্ডন হয়েছে কিনা। আমার সবটা পড়ে মনে হল, লিট্ল্ তাঁর বিপক্ষতাত্ত্বিকদের যুক্তি খন্ডন করতে পারেননি। আমি খুব ভয়ে ভয়ে অধ্যাপক দত্তর কাছে আমার বক্তব্যটুকু লিখে নিয়ে গেলাম। তিনি সযত্নে সবটা পড়ে বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ।’ আমার ধারণা তিনিও বুঝেছিলেন যে লিট্‌লের উত্তর যুক্তিদৃঢ় হয় নি, কিন্তু ক্লাসে সেকথা বলেন নি।

অধ্যাপক দত্তর বিনয়ের দ্বিতীয় উদাহরণ আসবে, আমার State Bank of India-র ইতিহাস লেখার প্রবেশের সময় থেকে। State Bank of India-র ইতিহাস লেখার তোড়জোড় বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। আমি যখন কেম্‌ব্রিজে পড়াচ্ছি সেই সময়ে জি.বি. কুলকার্নি নামে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক স্টেট ব্যাংকের পূর্ণ সময়ের আধিকারিক হিসেবে এই কাজের ভার নিয়েছিলেন। তিনি সে কাজ করে উঠতে পারেন নি এবং আমি আংশিক সময়ের project হিসেবে সেই ইতিহাস লেখার কাজ নেওয়ার পরে কুলকার্নির জন্যে সংগৃহীত বহু দলিল আর খুঁজে পাই নি। কুলকার্নির পরে এই কাজের ভার নিয়েছিলেন পুনার গোখ্‌লে ইনস্টিটিউট অব্ ইকনমিক্স্ অ্যান্ড পলিটিক্‌সের দুই গবেষক। তাঁরা বোধ হয় একটা মোটা দাগের কিছু লিখেছিলেন, স্টেট ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ সেটাকে নিম্নমানের জিনিস বিবেচনা করে আমাকে দেখতেই দেন নি।

১৮৭৬ সালে Presidency Banks Act পাশ করে স্টেট ব্যাংক্ এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের পূর্বসূরী Bank of Bengal (তাকে সাহেবরা ‘বঙ্গাল বেঙ্ক’ নাম দিয়েছিল), Bank of Bombay আর Bank of Madras মোটামুটি একই ছাঁচে ঢালা হয়। সেই আইনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্টেট ব্যাংকের ইতিহাস লেখার তোড়জোড় আবার শুরু হয়। তখন ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ, অর্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ভবতোষবাবুর কাছে পরামর্শ চান কাকে এ কাজের ভার দেওয়া যায়। ভবতোষবাবু তখন আমার নাম করেন এবং এ-ও বলেন যে আমার ওপর যেন সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং আমার স্কন্ধে যেন কোনও Editorial Committee না চাপানো হয়। আমাকে যখন এই কাজ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হল, তখন আমিও একই শর্ত করিয়ে নিয়েছিলাম : আমি যা লিখব তা স্টেট ব্যাংকের কর্তাব্যক্তিদের পছন্দ না হলে তাঁরা সেটা প্রকাশ না করতে পারেন, কিন্তু আমার ওপরে যেন তাঁরা খবরদারি না করেন। ভবতোষবাবুর কাছে গেলে তিনি বলেন যে যখন Reserve Bank of India-র প্রথম অনুমোদিত ইতিহাস লেখা হয় তখন তিনি তার Editorial Committee-র আমন্ত্রিত সভ্য ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ সুখকর হয় নি। সেই সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন চিন্তামন দেশমুখ। দেশমুখ ছিলেন আই.সি.এস. এবং রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর। তিনি ব্রিটিশদের বশংবদ আধিকারিক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে যে ইতিহাস লেখা হল তা অনেকখানি দাঁড়াল দেশমুখের স্তুতিপত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে বাংলা এবং পরে পশ্চিমবাংলায় অনেকগুলি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। দেশমুখ তখন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর। সেই সংকট কালে রিজার্ভ ব্যাংক নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। দেশমুখ-সঞ্চালিত ইতিহাসে এই সংকটের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন বিষয়ে এই ইতিহাসে ভুল তথ্য দেওয়া আছে, আমি আমার স্টেট ব্যাংকের ইতিহাসে তা দেখিয়েছি এবং লেখার আগে অধ্যাপক দত্তকেও বলেছি। আমার ধারণা, ভবতোষবাবু এই ধরনের ত্রুটি সহজেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক ভদ্রতাবশত জোর দিয়ে ত্রুটি শোধরাতে যান নি।

তৃতীয় একটি উদাহরণ দিয়ে আমি এই বিষয়টার ওপর যবনিকাপাত করব। ভবতোষবাবু যখন আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডারে (IMF-–এ) দক্ষিণ এশিয়া দপ্তরের অবেক্ষক ছিলেন, তখন আই.এম.এফ.-এর ধনীতোষণ এবং দরিদ্রনিপীড়ন নীতি চালু হয় নি। তখনও তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেখা যে, হঠাৎ করে কোনও দেশ বৈদেশিক মুদ্রাসংকটে না পড়ে এবং অনিবার্য কারণে কোনও দেশ সেই সংকটে পড়লে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। ১৯৭০-এর দশক থেকে আই.এম.এফ.-এর কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল : যে দেশ যত বেশি বিড়ম্বিত, তার বুকের ওপর তত বেশি বোঝা চাপান তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় অধ্যাপক দত্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে আন্তর্জাতিক মুদ্রাসমস্যা এবং আই.এম.এফ.-এর প্রকৃত কাজ কী হওয়া উচিত এই দ্বৈত বিষয়ে চার-পাঁচটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অনেক কষ্টেও আমরা তাঁকে দিয়ে এই বক্তৃতাগুলি বই-এর আকারে প্রকাশ করাতে পারি নি। সেই বক্তৃতামালা ছাপা থাকলে একটা মূল্যবান দলিল হয়ে থাকত।

অধ্যাপক দত্ত যখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসে শিক্ষা দপ্তরের সচিব হিসেবে কাজ করছেন, তখনই প্রেসিডেন্সি কলেজে নকশাল আন্দোলন শুরু হয়। সে সময় ছাত্রদের নানা প্রতিবাদ, অবরোধ ইত্যাদি রুখবার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজে পুলিশ মোতায়েন করার প্রস্তাব দেন। অধ্যাপক দত্ত সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কলেজ ছাত্রশিক্ষকের জায়গা। ছাত্ররা যদি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত শাসনপ্রক্রিয়া না মানে, এবং দেশের আইন লংঘন করে তা হলে নিশ্চয়ই আইনশৃঙ্খলার রক্ষক সরকার সেই আইনভঙ্গকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সেই আইনভঙ্গ খুনখারাবির পর্যায়ে না যায়, পুলিশ সেই আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কলেজের বাইরে ব্যবস্থা নেবে, কলেজকে একটা জেলখানার নবসংস্করণ বানানো যাবে না। এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব নিদর্শন ছিলেন প্রেসিডেন্সির এক ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ হেনরি রশার জেম্‌স্। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লিপ্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ কলেজে প্রবেশ করতে চাইলে অধ্যক্ষ জেম্‌স্ তার অনুমতি দেন নি। অধ্যাপক দত্তর মতও ছিল যে শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার দায় শিক্ষক এবং ছাত্রের। বহিরাগতের ভূমিকা সেখানে শুধু পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করা। এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা দরকার যে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সনৎ বসুকে প্ররোচনা দিচ্ছিলেন সেই কলেজের কয়েকজন প্রথিতযশা অধ্যাপক। তাঁদের একজনের মতে নকশাল আন্দোলনের পিছনে ছিল ভারতকে চীনের অধীনস্থ করার উদ্দেশ্য। সে সময় কলেজে পুলিশ আনার বিরুদ্ধে ছিলেন জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তাপস মজুমদার এবং ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক সত্যেশ চক্রবর্তী। উপরিলিখিত অধ্যাপক এঁদের তিনজনকে মাও সে তুঙ, চু এন লাই এবং চু তে আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন। অগাধ পান্ডিত্য যে মতিভ্রমের চূড়ান্ত বাধা নাও হতে পারে এই ঘটনাবলী তার চমকপ্রদ উদাহরণ।

অধ্যাপক দত্তর বাংলা রচনা শুরু তাঁর বিদ্যালয়জীবন থেকেই। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তিনিও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম বই-ও ১৯৪৪ সালে লিখিত হয়েছিল বাংলায়। কথাশিল্পী সুবোধ বসু তাঁর শ্যালক ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, ‘জয় গোস্বামীর কবিতা পড়েছ?’ আরেকবার শারদীয় ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায় আমার সহপাঠী বন্ধু উদয়ন ঘোষের প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে চমৎকার একটি গল্প পড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি উদয়নকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলাম।

ভবতোষ দত্ত যদিও সারাজীবনই লিখে গিয়েছেন, কিন্তু সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর লেখার ধার যেন ১৯৭০-এর দশক থেকে আরও বেড়ে গেল। তিনি ১৯৬২ সাল নাগাদই বলেছিলেন যে তিনি অধ্যাপনা থেকে অব্যহতি নিচ্ছেন, কারণ হালের অর্থবিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু অবসরগ্রহণের পর সুদীর্ঘ ২৭ বছরের লেখাপত্রে তাঁর অর্থবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির ওপর দখল এতটুকু শিথিল হয়েছিল বলে বোধ হয়নি। তাঁর গ্রন্থপঞ্জী এবং রচনাকাল দেখলেই তাঁর জীবনব্যাপী মনীষার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই তালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ তাঁর অনেক বাংলা এবং ইংরেজি প্রবন্ধ অগ্রন্থিত রয়ে গেছে।

১। **ধনবিজ্ঞান**, বিশ্বভারতী ১৯৪৪; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১ (এই বইটি বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থাবলীর পংক্তিভুক্ত।)

২। **অর্থনীতির পথে**, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭।

৩। **ভারতের আর্থিক উন্নয়ন**, আনন্দ ১৯৮৪।

৪। **দৃষ্টিকোণ**, এক দশকের অর্থনীতির ধারাভাষ্য, প্রতিক্ষণ ১৯৮৫।

৫। **আট দশক**, প্রতিক্ষণ ১৯৮৮ (এইটি অধ্যাপক দত্তর আত্মজীবনীভিত্তিক রচনা। বাংলা ভাষায় আত্মজৈবনিক গ্রন্থাবলীতে আরেকটি মণির সংযোজন এটি। বিশেষ করে অধ্যাপক দত্তর শিশুকৈশোরের দিনগুলির অসাধারণ আলেখ্য রয়েছে এই বইটিতে। বাংলা আকাদেমি এই বইটির জন্য অধ্যাপক দত্তকে রবীন্দ্রপুরস্কার অর্পণ করেছিল)।

৬। **শিক্ষা ভাবনা**, নাভানা, ১৯৮৮। (অধ্যাপক দত্ত সাধারণভাবে শিক্ষাসম্বন্ধে নানা লেখা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা কমিশনের সভাপতি হিসেবে অসাধারণ একটি প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন। তিনি আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, অধ্যাপকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কোনও বক্তব্য কমিশনের কাছে পেশ করে নি)।

৭। **সাত-সতেরো**, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯১।

৮। **প্রতিক্ষণ বাজেট বিশ্লেষণ সংকলন**, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫ (এ প্রসঙ্গে ৪ নম্বর বইয়ের ওপর মন্তব্য দেখুন)।

৯। **প্রসঙ্গ অর্থনীতি**, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৫।

১০। **তামসী**, প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫।

আমাদের দেশে Delivery of Books Act অধিকাংশ বাংলা বইয়ের প্রকাশক যে মানেন না, এবং সেই আইন বলবৎ করার ক্ষমতা যে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির নেই, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল যে অধ্যাপক দত্তর অধিকাংশ বাংলা বই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় নি।

অধ্যাপক দত্ত শেষের তিন-চার বৎসর চোখের ভিতরের রক্তক্ষরণে অন্ধ হয়ে যান। সেই সময়েও তিনি অন্যের পড়া বই ও খবরের কাগজের লেখা শুনে শ্রুতিলিখন দিয়ে ‘তামসী’র

প্রবন্ধগুলি লিখে গিয়েছেন। সেই সময়েও তাঁর জীবনের উপরে বিশ্বাস ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অন্ধত্ব ও বার্ধক্য তাঁর আত্মশক্তিকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরাস্ত করতে পারে নি। 'আট দশক'-এর তিন-চার পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, এবং ঈশ্বর থাকলেও কেন সেই ঈশ্বরকে পুজোর নামে ঘুষ দেওয়ায় তিনি পক্ষপাতী নন।

আমি সম্প্রতি খোঁজ নিয়ে জানলাম অধ্যাপক দত্তর অধিকাংশ বই বাজারে পাওয়া যায় না। **আট দশক** ছাড়া প্রতিক্ষণ প্রকাশিত কোনও বই আমি লাইব্রেরির জন্য সংগ্রহ করতে পারি নি। ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হদিশ পাওয়া যায়, কাদের কাছে গেলে হাতফেরতা বই দুই-এক কপি পাওয়া যাবে। বাংলায় সে ধরনের বাণিজ্যিক সংস্থা আজও গড়ে ওঠে নি। কোনদিন হয়তো দেখা যাবে অধ্যাপক দত্তর বইগুলির জন্যেও ইংল্যান্ড বা আমেরিকার কোনও লাইব্রেরিতে খোঁজ করতে হচ্ছে। এবার আমি অধ্যাপক দত্ত লিখিত ইংরেজি বইয়ের তালিকা দিচ্ছি।

১। Economics of Industrialisation, Calcutta, World Press, 1952; 2nd edition, 1957; third edition, 1960; fourth edition, 1984.
২। Economic Development and Exports (with S.K. Chakraborty, M. Bhattacharya and G. Ghosh), Calcutta, World Press, 1962.
৩। Evolution of Economic Thinking in India, Calcutta, Federation Hall Society, 1962.
৪। Essays in Plan Economics : A Running Commentary on Indian Plan Experience, Calcutta, World Press, 1963.
৫। Contents of Economic Growth and other Essays, Calcutta Research India Publications, 1977.
৬। Indian Economic Thought: Twentieth Century Perspectives, 1900-1950, New Delhi, Tata McGraw-Hill, 1978.
৭। Social Justice in a Mixed Economy, Calcutta, University of Calcutta.
৮। Indian Planning at the Crossroads, Calcutta, Oxford University Press.

এই সমস্ত বইয়ের বিস্তৃত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। আগেই বলেছি যে, Economics of Industrialisation ভারতের আর্থিক অগ্রগতির আলোচনার একটি পথিকৃৎ গ্রন্থ। এই বইতে আমাদের দেশের দারিদ্র্য, বেকারি, কৃষি ও শিল্পের শ্লথগতির কারণ এবং নিরাময় সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, এখনও তার প্রাসঙ্গিকতা আছে। আমাদের দেশের বেকারির বিভিন্ন চেহারা ও তার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে এই বইতে।

আমি মনে করি এই বইয়ের উপসংহারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারপাশের পরস্পর বিরোধিতার যে বিশ্লেষণ আছে তা এখনও প্রণিধানযোগ্য এবং তার ওপর আরও গবেষণা হওয়া দরকার। অধ্যাপক দত্তের মত দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন, দেশের সম্পদ দিয়েই সেই উন্নয়নের ব্যয় বহন, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আয় বন্টনের সমতা একসঙ্গে চলতে পারে না। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের দেশে সরকারি হিসেবে দ্রুত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় ও সম্পদের বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে এবং আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা পূরণ করতে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ধার করতে হচ্ছে এবং বিদেশি মূলধনকে নানা বাড়তি সুবিধা দিয়ে দেশে টেনে আনতে হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থা কি অবশ্যাম্ভাবী ছিল? আমার নিজের মত হল এর বিকল্প আমাদের আছে, কিন্তু তার জন্যে বিরাট সামাজিক পরিবর্তন এবং ধনীতোষণ নীতি পরিহার করা দরকার। অধ্যাপক দত্তর চতুস্পার্শ্বিক প্রতিপাদ্যের আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করলে আমাদের বিশ্লেষণ এখনও সমৃদ্ধ হতে পারে।

তাঁর **আট দশক** বইতে অধ্যাপক দত্ত পরিষ্কার বলেছেন যে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রথমে শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরে শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। (এই প্রসঙ্গে ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকের রাজ্যপাল ধর্মবীরের আচার-আচরণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য তীক্ষ্ণ এবং বিদ্রূপ)। তিনি এও বলেছেন তিনি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন শিক্ষকতা করে এবং পরের দিকে তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে। সেই তিনটি হল সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা। প্রথমটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে

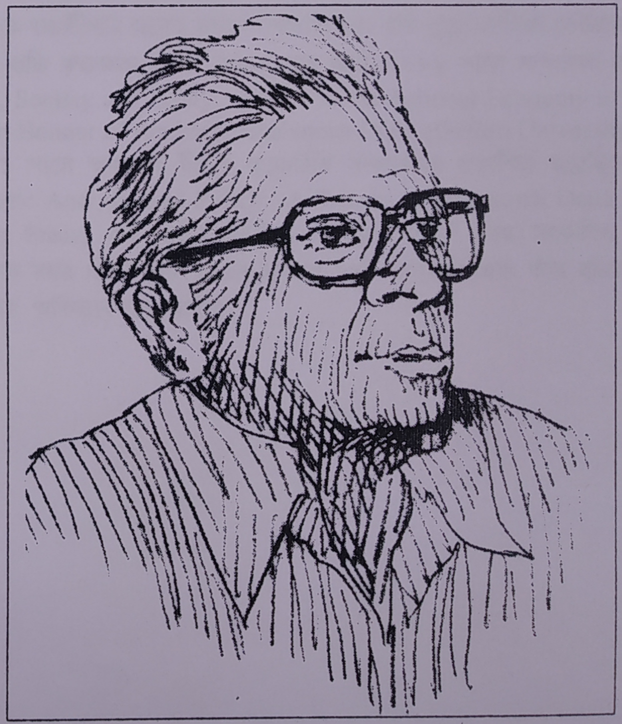

ভবতোষ দত্ত শিল্পী : চারু খান

তিনি নয় বৎসর তার পরিচালনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সংস্থা সমাজবিজ্ঞানের দ্রুত স্থান করে নেওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন যে, তার জন্যে ‘তাঁর গর্বের সীমা নেই।’ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসর পরে আমি সেখানে যোগ দিয়েছিলাম। অধ্যাপক দত্ত আমাদের স্নেহশীল অথচ সাবধানী অভিভাবকের চোখে দেখতেন। কোন্ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঠিক এবং কেন ঠিক, এবং কোন্‌টা ঠিক হলেও তার প্রক্রিয়াতে ত্রুটি থেকে যেতে পারে এ সমস্ত ব্যাপারে অধ্যাপক দত্ত তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিতেন। তিনি সভাপতির পদ ছেড়ে দেওয়ার পরও আমরা তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য দ্বারস্থ হয়েছি।

অধ্যাপক দত্ত এছাড়াও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। আরও বহু সংস্থার তিনি সভাপতি ছিলেন। এতগুলি সংস্থার পরিচালনা সমিতির সভাপতি থাকার জন্য তাঁর এক বন্ধু তাঁকে President General, West Bengal খেতাব দিয়েছিলেন। আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি অনেক সংস্থায় সভাপতিত্ব করতেন। অনেক সময়ই তা হত দায়সারা কাজ। অধ্যাপক দত্তর সঙ্গে তাঁদের তফাৎ হল যে তিনি প্রত্যেকটি দায়িত্বই খুব গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন এবং যখন সেই কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন না মনে করতেন, তখন তিনি ইস্তফা দিয়ে দিতেন।

অধ্যাপক দত্তকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকার বহু পরামর্শদাতা কমিটির সভ্য বা সভাপতি করে ডেকে নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের চতুর্থ ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং কমিশনের তিনি সভ্য ছিলেন। Newsprint নিয়ে কালোবাজারি দমনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সংবাদপত্রর বিষয়ে Fact-finding Committee করেছিল। উনি তার চেয়ারম্যান ছিলেন। শুভেন্দু দাশগুপ্ত তাঁর Research Officer-এর কাজ করেছিল। তার পরেই শুভেন্দু আমার সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল। তৎকালীন কার্যকলাপের তিনি মাঝে মাঝে কৌতুকাবহ, আবার মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণাদায়ী অভিজ্ঞতার বর্ণনা **আট দশক**-এ দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সরকার তাঁকে ১৯৫৯-৬০ কালীন মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্যে গঠিত এক কমিটির সভাপতি করেছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট সরকার কোনদিন প্রকাশ করেনি।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার তাঁকে অনেকগুলি কমিশনে কমিটির সভ্য করেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উচ্চশিক্ষা কমিশন, যার রিপোর্ট জমা পড়েছিল ১৯৮৪তে। আবার সরকার কীভাবে অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে জিনিস কিনবে যাতে করে সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ে, আরও কর্মসংস্থান হয় এই বিষয়ে ভবতোষবাবুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সুপারিশ মেনে বেশ কিছুদিন পশ্চিমবাংলা সরকার সরকারি সংস্থাকে লাভজনক জায়গায় রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একদিকে আমলাতান্ত্রিক বাধা, দুর্নীতিচক্রের কলকাঠি নাড়া, এবং তারপর নব্য উদারনীতির দাপটে এই সুপারিশগুলি তামাদি হয়ে যায়। অধ্যাপকদের অনীহা, কাঠামো বদলানোর নানা ঝক্কি, এইসবের জন্যে উচ্চশিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কাজে লাগানো হয় নি। অধ্যাপক দত্ত কলকাতার বাড়ির পরিকল্পনার একটি কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। কিন্তু সত্যনারায়ণ পার্কের নীচে বাজার

বানানো এবং আরও দুয়েকটি অনুরূপ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি বিমর্ষভাবে লিখেছেন যে বেশির ভাগ কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করা যায় না, কারণ সংশ্লিষ্ট আমলা, রাজনৈতিক নেতা বা কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের অবস্থান বদলাতে চান না। তাছাড়া দুষ্টচক্র তো আছেই। কিন্তু অধ্যাপক দত্তর এই সমস্ত কমিটির সুপারিশের পর্যালোচনা হওয়া দরকার, কারণ আমাদের জানা উচিত, ইতিহাস কেন বারবার বেঠিক মোড় নিয়েছে এবং তার থেকে ভবিষ্যৎ জীবন তৈরি করার জন্য চিন্তার খোরাক কীভাবে জোগাড় করা যায় তার নির্ণয়ের জন্য। আমার দুঃখ হয়, এত সব মামুলি বস্তাপচা বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র লেখা হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উৎসাহী অর্থনীতিবিদ্, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সাহিত্যের ছাত্র অধ্যাপক দত্তর কাজ নিয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষণা করতে এগিয়ে এল না।

১৯৮৯ সালের ১০ই জুলাই অধ্যাপক দত্তর পঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গিনী অমলা (বসু) দত্তর দেহাবসান ঘটে। (তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ৪ঠা মে)। অধ্যাপক দত্ত হিন্দুশ্রাদ্ধ অথবা আনুষ্ঠানিক কোনও শ্রাদ্ধাচারে বিশ্বাস করতেন না। তিনি লিখেছিলেন যে হিন্দুদের মন্ত্রে আছে মৃত্যুর পর আত্মা নিরালম্ব বায়ুভুত হয়ে যায়। তাই যদি হয়, তাকে আবার ডেকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টার কী অর্থ হয়? তাঁর সস্নেহ আহ্বানে অধ্যাপক বরুণ দে এবং আমি অমলাদেবীর স্মৃতিচারণ করেছিলাম।

অধ্যাপক দত্ত জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছিলেন। তার পুরো তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি ১৯৮৮ সালে সম্পাদনা করেছিলাম Economy, Society and Polity : Essays in the Political Economy of Planing in India in Honour of Professor Bhabatosh Datta (Oxford University Press), আর ১৯৯১ সালে অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল Essays in Economic Analysis and Policy : A Tribute to Bhabatosh Datta (Oxford University Press), এই দ্বিতীয় বইটিতে আমারও একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল।

অধ্যাপক দত্তর প্রয়াণ ঘটে ১৯৯৭ সালের ১১ই জানুয়ারি এবং তাঁর ছাত্ররা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অভিভাবককে হারায়।